Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 329–335
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনে জটিলতার নানা চিত্র : প্রেক্ষিত সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের রম্যরচনা

শুভঙ্কর রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : subhankar.roy84@yahoo.com

Keyword
মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন যন্ত্রনা, দাম্পত্য কলহ, দারিদ্রতার চিত্র, বর্তমান সমাজের বাস্তবিক রূপ, নারীর বিচিত্র রূপ, মূল্যবোধ, জীবনবোধ।

Abstract
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের রচনাগুলিতে সমাজের বেশ কিছু বিষয় বারবার উঠে আসে। মানুষ হাসতে চায় কারণ জীবন থেকে হাসি উবে যাচ্ছে। নিজের ভুল-ত্রুটি, নিজের দুর্বলতা, দৈনন্দিন জীবনের অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছতায় ভরা নিজের সমস্যাগুলি দেখে হাসা। সমাজের জটিলতা যতই ঘনীভূত হচ্ছে আমাদের চাতক সত্ত্বায় রসের চাহিদাও তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। শুধুমাত্র হাসির যোগান দিতে তিনি কল্পিত কোনো কাহিনীকে অবলম্বন করেননি। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনের নানা চিত্রকে তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। আসলে তিনি বাস্তবে নিজের চোখে যা দেখেছেন তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর রচনায়। দাম্পত্য কলহ থেকে শুরু করে মূল্যবোধের চিত্র, দারিদ্রতার প্রতিচ্ছবি, বর্তমান সমাজের বাস্তবিক রূপ, নারী প্রগতির সাংঘাতিক রূপ, জীবনবোধ সমগ্র বিষয় তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধটির মধ্যে এই বিষয় সমূহগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

Discussion
বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। রম্যরচনা লিখে তাঁর সাহিত্য জগতে প্রবেশ। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য কলম ধরলেন এক গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য। বর্তমানে ডাক্তারবাবুদের মুখে প্রায়শই শোনা যায় যদি রোগমুক্ত জীবন যাপন করতে চান, যদি আয়ু বাড়াতে চান তাহলে মুখের হাসি বজায় রাখুন। ডাক্তার বাবুরা তো বলেই খালাস। অপরদিকে হাজারো সমস্যা নিয়ে হাসতে পারা কি সহজ কাজ? লঘু চালে লেখা এই ছোট ছোট রচনাগুলি হাসির মোড়কে জীবনের সব কিছুকে দেখতে শেখায়। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় তিনি লেখেননি, যেনো ছবি এঁকেছেন। চোখের সামনে মনে হয় চিত্রকল্প ভেসে, ওঠে যেনো চলচ্চিত্র দেখছি। আমাদের হাসির যোগান দিতে তিনি কোনো কল্পিত কাহিনীকে গ্রহণ করেননি। জীবন, বিশেষ করে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন জীবনের

খুঁটিনাটির অকিঞ্চিৎকরতা এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিজেরই তৈরী সমস্যার জালে জর্জরিত মধ্যবিত্ত জীবনকে তিনি তির্যক দৃষ্টিতে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সাহিত্যের সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি। সাহিত্যের সাধনা আনন্দরস সৃষ্টি, আর সাহিত্য সাধনার সার্থকতা -সমাজকে আনন্দের দিকে নিয়ে যাওয়া। সাহিত্য আপনার সৃষ্ট আনন্দে বিভোর হয়ে থাকলে চলেনা। সাহিত্যে আত্মম্ভরিতা দোষ প্রবেশ করলে সাহিত্য কৃত্তিম হবেই, তার উন্নতি অসম্ভব। সাহিত্যের চরম সাধনা যুগধর্ম প্রকাশ করা, নতুন যুগ আনয়ন করা। যুগধর্ম প্রকাশ করতে হলে সাহিত্যকে বাস্তবের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে হবে, সাহিত্যকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বড়লোক-দীন, মধ্যবিত্ত লোক সাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, নিখিলের সংস্রবে না থাকলে সাহিত্যে বাস্তবতা আসবেনা। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের অভাব, মানুষ সুখ দুঃখের মধ্যে না পড়লে সাহিত্যে বাস্তবতা অসম্ভব। সাহিত্য বাস্তবকে অবলম্বন করেই রস সৃষ্টি করে। রস জিনিসটার একটা আলাদা আঁধার থাকা চাই, সেই আঁধারটাই হচ্ছে বাস্তব। যুগে যুগে বাস্তব পরিবর্তন হচ্ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরস পাল্টে যাচ্ছে। বাস্তবের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। আর এই নিত্যতা আছে বলেই দেশ-কাল-পাত্র অতিক্রম করে অর্থাৎ বাস্তবকে অতিক্রম করে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য রসের আস্বাদন করতে পারি আমরা। লতা না থাকলে পদ্ম যেমন ঢলে পড়বে ঠিক তেমনই বাস্তবকে অবলম্বন না করলে সাহিত্যের সৌন্দর্য ফুটে উঠবে না। সাহিত্য যদি বাস্তবকে উপেক্ষা করে রস সৃষ্টি করতে চায় তবে সে রস কাগজের ফুলের মত অলীক ও কৃত্রিম হবে। আসল ফুল কাগজের গাছে ফোটে না জীবন্ত গাছে বিকশিত হয়। জীবন গাছ হচ্ছে সাহিত্যের আসল বাস্তব। আর সেই গাছ তার শেকড়ের দ্বারা জারিত অন্তরতম হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অটুট রেখেছে। সমগ্র জাতির হৃদয় থেকে তার রস সঞ্চার না হলে সাহিত্যের প্রকৃত সৌন্দর্য যে ফুটে উঠবে না শুধু তাই নয় সাহিত্য জীবনীশক্তি হয়ে নিরস গাছের মতো পড়ে রইবে।

বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টা বৃথা। সময়ের সাথে সাথে মানুষের মন, চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটে। সমাজকে উপেক্ষা করে কোন সাহিত্যিক বা শিল্পী তার সৃষ্টি কর্ম করতে পারেন না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বাস্তবতা অনুসৃত হবে তা নিয়ে দেশ-কাল-পাত্রভেদে নানারকম মত রয়েছে। সাহিত্যিক বস্তুজগৎ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং তার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে যখন সাহিত্যে প্রতিফলন করেন, তখনি সৃষ্টি হয় বাস্তববাদী সাহিত্য। তাই সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে বাস্তবতার পরিবর্তন ঘটে। গতকালের বাস্তব পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাতিল হয়ে আজ নতুন আরএক নতুন বাস্তবের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবনে যে নিত্যনতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে লেখক তার দিকে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্যার মোকাবেলা করেন। বাস্তববাদী সাহিত্যিকরা বিশ্বাস করতেন সাহিত্যের বিষয়বস্তু হবে বাস্তবজীবন ভিত্তিক, সমস্যা হবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ এর সঙ্গে সম্পর্কিত, চরিত্র হবে সজীব প্রাণবন্ত, লেখক হবেন জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং তার বর্ণনায় থাকবে যথার্থতা। যে কোন লেখকের কাছে পাঠক মানুষের মুক্তি পথের নির্দেশ আশা করেন। বস্তুবাদী ও বাস্তববাদী লেখকেরা জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংকটের ছবি আঁকলেও মুক্তির পথ নির্দেশিত করেননি। এই ধরনের বাস্তববাদী রা আর্থসামাজিক ব্যবস্থার সমালোচক মাত্র। ম্যাক্সিম গোর্কি তাই এদের ক্রিটিক্যাল রিয়ালিস্ট বলেছেন। সমালোচনামূলক বাস্তবতার সীমা অতিক্রমের চেষ্টা থেকে আর এক ধরনের বাস্তবতার জন্ম। ম্যাক্সিম গোর্কির পরিভাষায় তা হল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অর্থ হল সমাজবদলের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন কিছু গড়ে তোলা। সাহিত্যে সমাজবদ্ধ কাজের মানুষেরা স্থান পেল, মহৎ মানুষদের জায়গা দখল করল ছোট ছোট মাপের সাধারণ মানুষ। সমাজ বাস্তবতা মানব জাতির অধিকার অর্জন এবং সংরক্ষণের জন্য অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করে যায়। সমাজ বাস্তবতা আমাদের এক নতুন ধরনের মানবতাবাদের সঙ্গে পরিচয় করায়। সব ধরনের শোষণ-বঞ্চনা এবং বন্ধনের বিরুদ্ধে ছোট-বড় প্রতিটি মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠলো। উদ্দেশ্য মানবাধিকার অর্জন। আর এই সংগ্রামী মানুষেরা হলেন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ। নির্যাতন, কুসংস্কার, ভন্ডামি সব কিছুর বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর হয়ে গড়ে তুলতে চায় এক শোষণমুক্ত সমাজ। কারণ তারা বুঝেছে তাদের বঞ্চিত এবং নির্যাতিত হওয়ার পেছনে কোন অলৌকিক দৈব কাজ করেনা, তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যের শিকার। সমাজ বাস্তবতাসমৃদ্ধ সাহিত্যে সমকালীন রীতিনীতি অর্থনৈতিক সংঘাত সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিমাণ লেখকের সমাজ সচেতনতা ইত্যাদির প্রতিফলন খুঁজে নিতে হয়। আর এদের প্রতিফলন নির্ভর করছে সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। তাই সাহিত্যিক ভেদে এর তারতম্য ঘটে। ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বে ব্যক্তি মর্যাদা ও স্বতন্ত্র

রক্ষার প্রশ্নে লেখকের সহানুভূতি, এবং তিনি দ্বন্দ্বের সমাপ্তি কিভাবে ঘটাতে চান অর্থাৎ সমস্যার সমাধানে লেখক এর দৃষ্টিভঙ্গি কিরকম, তার উপর নির্ভর করছে একজন লেখক সমাজবাদী কিনা, সেই সিদ্ধান্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমরা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের রম্যরচনাগুলি আলোচনা করে দেখবো।

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রম্যরচনাকার হিসেবে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের নাম চিরস্মরণীয়। তাঁর রম্যরচনায় যেমন হাসির ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে বেদনা, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সংকটের চিত্র, স্বপ্ন-কল্পনা, ঠিক তেমনি ধরা পড়েছে সমাজ বাস্তবতার চিত্রটিও। আসলে তিনি হাসির ছলে সমাজকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতেও ছাড়েননি। বর্তমান সমাজের বাস্তব রূপকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লক্ষ্য করেছেন। আর সেই কারণেই তাঁর রচনায় সমাজবাস্তবতার চিত্রটি অতি সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে। এখানে আমরা সঞ্জীব বাবুর কতকগুলি রম্যরচনা আলোচনা করে দেখব।

'মধু' রম্যরচনার মধ্যে লেখক বর্তমান সমাজ বাস্তবতার চিত্রটি অতি সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। লেখক প্রথমেই উল্লেখ করেছেন—

> "চল্লিশে আগুন,পঞ্চাশে সোচ্চার। কি হলো? পৃথিবীতে এসে কি পেলুম? চোখ বাঁধা কলুর বলদের মতো সংসারের ঘানি তে ঘুরেই গেলুম, দু চার ফোঁটা তেল যা বেরোল তাহাতেই দিন কতক তেলানি হল, এখন আর বয়সের সরষেতে তেল নেই। টাকা শুধু ঘুরেই চলেছে। খোল ছাড়া আর কিছুই বের হচ্ছেনা। সবসময় একটা হাহাকার, জীবন আমার বিফলে গেল লাগিল না কোন কাজে।"[১]

কৈশোর থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের নানা রঙের ছবি এখানে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন রম্যরচনাকার। বর্তমান সমাজের যে চিত্র সেটাই তিনি দেখাতে চেয়েছেন 'মধু' রম্যরচনার মধ্যে দিয়ে। ছাত্রজীবন যেমন তার ভালো কাটেনি ঠিক তেমনি বিবাহিত জীবনের নানাদিক ও সমস্যায় পরিপূর্ণ। পরীক্ষার ফল ভালো হলে অভিভাবকেরা মাথায় তুলে রাখে–

> "আমার সোনার চাঁদ আমার হীরের টুকরো। পরীক্ষার আগে খুব কদিন ঘি,দুধ, ডিম,ছানা, নরম পাক, কড়া পাক। আর ফল খারাপ হলে ওটা একটা অপদার্থ ষাঁড়ের নাদ। ওর পেছনে খরচ করা মানে ভস্মে ঘি ঢালা। গোটা সংসারে বিষন্ন সানাইয়ের পোঁ-এর দ্বারা আর কি হবে। ...তোমার ভবিষ্যৎ রিক্সাটানা ঠেলাগাড়ী চালানো।"[২]

পড়াশোনার দিকটি খারাপ হলেও প্রেমের দিক থেকে একদম পাকা খেলোয়াড়। মেয়ের দিকে আড়চোখে তাকানো থেকে শুরু করে প্রেমপত্র লেখালেখিতেও পটু। কাঁঠালের রসের মত প্রেমের রস ঘননীল। একসময় প্রেমে ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রেম কি যাচিলে মেলে সহসা উদয় হয় সহযোগ পেলে। যা অসুখের যা পথ্য–

> "ছাদের আলসে,হাতে গালিব; বুলবুল নয়,কাকে কর্কশ ধ্বনি; দিলকে দিল সে নিকলা পেন নিকলা দিলসে/হৈ তেরে তিরকা পৈকান অজীজ।"[৩]

জীবনের এই পর্যায়টা কাটতে বেশি দিন দেরি হয়না। প্রেমের ভূত ছেড়ে যায়। পিতার অবসর, মায়ের গেঁটেবাত, বোনের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাওয়া, চারপাশ থেকে চেপে ধরে সংসারের মায়াজাল। বন্ধুবান্ধবরা সবাই যখন সবদিকে কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে তখনই জ্ঞান নেত্র খুলে যায়। মনে হয় সংসার এক কারখানা। তখন প্রেম নয়, উপার্জন চরিত্র নয় অর্থ। অর্থ আর পদ দেখেই এগিয়ে আসে বিবাহ। বিবাহের কতকগুলি জিনিসপত্রের শহীদ ঘোড় সওয়ারী লাগাম হাতে উপস্থিত হয় এক জীবন সঙ্গিনী। প্রথমে মৃদুকণ্ঠে মাসে মাসে ভ্যলুম চড়তে চড়তে শেষে চিরস্থায়ী লাউডস্পিকার। এ যে এক হান্টারওয়ালি। প্রেমপত্রের বদলে বাপের বাড়ি থেকে পত্র–

> "টাকা পাঠাও। খোকার ফুড কিনতে হবে। বুড়ির মেয়ের মুখে ভাত| সোনার নোলক না দিলে প্রেস্টিজ পাংচার। ...আমার কি লোকে তোমাকেই ছ্যা ছ্যা করবে। বলবে টেকো বউ।"[৪]

অন্যদিকে গর্ভধারিণী মায়ের চিকিৎসার অভাব, পিতার পরিধানের কাপড়চোপড় তাদের আহার বিহার কোনকিছুই পাল্লা দিয়ে পারছেন না। নিজের জন্য শুধু এক গেলাস জল। একদিকে পিতার হাহাকার –

> "হায় প্রভু একটু বাড়াও! এই আমার জীবনের পুরস্কার। ছেঁড়া লুঙ্গি, ফুটো গেঞ্জি, নুন ছাড়া তরকারি, ষাট টাকা কেজি গুমো গন্ধওয়ালা চা,আর হৃদয় নয় এত বড় একটা ইসকিমিক হার্ট।"[৫]

অন্যদিকে নিজের হাহাকার–

> "হাই প্রভু একটু বাড়াও। ছোট্ট একটা প্রমোশন। বাজার দরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছিনা আর। পাখির ছানা হল এরপর পোনা হবে,তাদের অসুখ, আহার, বিহার, শিক্ষা,প্রেম,সংসারে সন্তান। এই মায়াবী সংসারের একই চক্র। সংসারের তিনটে জিনিস বাড়ে- বয়স দেনা আর চিনি। আর বাড়ির দুশ্চিন্তা, কর্তব্য।"[৬]

যে দরজা দিয়ে জীবন বিলিয়ে একবার মৃত্যুর প্রাঙ্গণে পৌঁছায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে দেখা যাবে মিছিল চলছে - মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে হাহাকার করতে করতে।

> "চলেছে পিতামহ, পিতা, পুত্র, তস্যপুত্র। প্রজন্মের পর প্রজন্ম। এক দুয়ারে প্রবেশ অন্য দুয়ারে নিষ্ক্রমণ। অভিজ্ঞতা মধুর নিষ্পেষণ।"[৭]

আসলে লেখকের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে অর্থাৎ ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবন যেন তিক্ততায় পরিণত হয়ে গেছে। তাই জীবন কখনোই মধুময় হয়ে ওঠেন। মধুময় জীবনের পরিবর্তে তিক্ততাই ভরে উঠেছে জীবন। তাই লেখক ব্যঙ্গ করে রচনাটির নাম দিয়েছেন 'মধু'। আসলে রচনাটির শিরোনাম 'মধু' হলেও মধু শব্দের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বাস্তব সমাজ জীবন, যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনযন্ত্রণার নানা চিত্র। আসলে তিনি মজাদার আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে বাস্তব সমাজের চিত্রটি খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন 'মধু' রম্যরচনায়।

'ছত্রপতি' রম্যরচনায় তিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি একটা ছাতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। ছাতার যেমন বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে ঠিক তেমনি বর্তমান সমাজের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। লেখকের ভাষায়-

> "ছাতায় ছাতায় ইন্টারলক হয়, শিঙে শিং লাগানো গরুর মত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। দুই বীরই বলতে থাকে আয় দেখি তোর হিম্মত কত!"[৮]

এখানেই বর্তমান সমাজের চিত্রটি উজ্জ্বল। আধুনিক সমাজের বাস্তব রূপ থেকে তিনি 'লাইসেন্স' রচনার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। আগে পুরুষশাসিত সমাজে সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করত মহিলারা। কিন্তু বর্তমান সমাজে তাদেরও স্থান সমান। লেখক একটু ব্যঙ্গ করেই বলেছেন–

> "আনট্রেন্ড অ্যালসেশিয়ানের মত, আনট্রেন্ড স্বামী সংসারের এক মহা সমস্যা। স্বামীদের একটা ট্রেনিং ক্যাম্প থাকা উচিত। যেমন শিক্ষক হতে গেলে বিটি পাস করতে হয়, সেরকম স্বামী হতে গেলে টি.এস পাস করতে হবে। টি.এস মানে- ট্রেইন্ড স্বামী।"[৯]

সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম স্ত্রীর সঙ্গে সব ভাগ করে নিতে হবে। এই কাজ যে স্বামীরা করতে পারবে তারাই ভালো থাকবে আর সেটার ব্যতিক্রম ঘটলেই হবে অনর্থ। লাইসেন্স ছাড়া যেমন গাড়ি চালানো যায় না, সেরকম লাইসেন্স ছাড়া সংসার গাড়ির ড্রাইভার হওয়া যায়না। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখক সংসারের স্বামী-স্ত্রীকে দুই সতীনের সঙ্গে তুলনা করতে ছাড়েননি। আধুনিক সমাজে জয়-পরাজয়ের জীবন যুদ্ধে হারানো যায়না বা হার স্বীকার করেন না স্ত্রীরা। কারণ পরাজিত করার পক্ষপাতি অস্ত্রটি বিয়ের রাতেই তার হাতে তুলে দেন স্বামী। লেখক একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে বলেছেন–

> "আমরা পুরুষেরা সেজেগুজে চুনোট করা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, গাঁটছড়া বেঁধে তাকে আদর করে শাঁখ বাজাতে বাজাতে সারা পাড়াকে জানান দিয়ে নিয়ে আসি। ...খাল কেটে কুমির নয়,জীবনবৃত্তে আনা হল স্ত্রী।"[১০]

আসলে বর্তমান সমাজের চিত্রটি তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন আর তাই তাঁর রচনায় তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বর্তমান সমাজে নারী জাতি বাকযুদ্ধে পটু আর সেই কারণে পেরে ওঠা দুষ্কর। কারণ উকিল মরে স্ত্রী হয়। যেমন প্রখর স্মৃতিশক্তি তেমনি আর্গুমেন্ট করার ক্ষমতা। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনকেও তিনি অতি সুন্দর ভাবে 'অপরাজিতা' রচনার মধ্যে দেখিয়েছেন। বর্তমান সমাজে সংসারে একমাত্র শান্তি বজায় রাখার কৌশল হল নারী অর্থাৎ স্ত্রীকে ভয় করা। কারণ পুরুষেরা বাইরের জীব আর নারীরা সংসারের। কথাই বলে বাঘের সঙ্গে বিবাদ করে জঙ্গলে বাস করা যায় না। জীবন রশিক লেখক 'কৃপাময়ী' রচনায় তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। 'খেলা' রচনাটির মধ্যে মধ্যবিত্ত জীবনের করুণ কাহিনী চিত্র লক্ষ্য করা যায়। রচনার প্রথমেই লেখক উল্লেখ করেছেন ধনুকের মতো উঁচু হয়ে থাকা একটি সেতু। লেখক সেই রেল লাইনের ধারে একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের বর্ণনা দিয়েছেন। লেখকের ভাষায়–

> "খুপরির মাথার উপর ভাঙাচোরা টিন সাজিয়ে ছাদ। ঝড়ের বাতাসে টিন যাতে পাখা মেলতে না পারে তার জন্য অজস্র পাথরখণ্ড চাপান। খুপরির যা উচ্চতা,তাতে একজন মানুষ কোনরকমে দাঁড়াতে পারে। শুধুমাত্র একটি

প্রবেশপথ আছে। আলো-বাতাস ঢোকার কোন পথ নেই। আবার সেই প্রবেশ পথেই কেমন ব্রীজের রেলিং টপকে ওঠানামা।"[১১]

ঘরের বর্ণনা দেখেই বোঝা যায় দারিদ্র্যের চরমতম রূপটি। তবুও সাইনপেন্টার ও তার স্ত্রী অতি সুখে সংসার জীবনযাত্রা অতিবাহিত করছিলেন। একসময় তারা দুজনেই কাছ থেকে অবসর নেন বয়সের তারতম্যের কারণে। দেশবাসীর মধ্যে দারিদ্র্যের ছাপ থাকলেও মনে তার কোন স্পর্শ নেই। এখন ব্যস্ত পৃথিবীর দিকে পিছন ফিরে সুখী দম্পতি লুডু খেলায় মত্ত থাকে। আসলে মধ্যবিত্ত জীবনে দারিদ্র্যের ছাপ থাকলেও তাদের মনে কিন্তু দারিদ্র্যের ছাপ ফেলতে পারেনি। 'জ্বালা' রচনাটির মধ্যেও লেখক মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সংকট ও সমস্যার চিত্রকে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। অনেক প্রকারের জ্বালার মধ্যে পেটের জ্বালা সবচেয়ে বড় জালা। মানুষ যত শিক্ষিত সভ্য আর বিত্তশালী হবে ততই সে প্রকৃতি বিমুখ হবে। মানুষের এই প্রজাতির তলায় আর এক জাতি আছে, যাদের সংখ্যা অনেক- এরাই হলেন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। লেখক এর ভাষায়–

"এই মধ্যবিত্ত সমাজের খ্যাকোর-ম্যাকোর প্রায় ভোর থেকেই শুরু হবে। পরিবারের পাচন বড়ি খেয়ে শয্যা ত্যাগ। চটের ব্যাগ হাতে পায়ে ক্ষয়া চটি।"[১২]

বাজারের পরিবেশ মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। মধ্যবিত্তের বাজার মানে আবর্জনায় ভরাকাদা থকথকে একটা অপরিছন্ন পরিবে। সেই পরিবেশেই পেটের দায়ে মধ্যবিত্ত মানুষ বসে আছেন গায়ে গা লাগিয়ে। সেখানেই বসে বিক্রেতা পরমানন্দে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। পচা মাছের গন্ধ যেনো আতরের গন্ধ। আসলে সবই হচ্ছে টাকা। টাকার জন্যই মানুষ লাশকাটা ঘরে পচা মরা সেলাই করে ঘুগনি খেতে পারে। কারণ পেটের জ্বালা নিরসনের একমাত্র সহায় টাকা। আর এই পেট এমন একটা জিনিস যার সম্পর্কে বলতে গিয়ে কাব্য করে বলা হয়েছে– 'শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়'। মধ্যবিত্ত জীবনে আয় বুঝে ব্যয় করতে হয়। যাদের টাকার জোর আছে তারা সকালে হেবি ব্রেকফাস্ট করবেন। ফলের রস থেকে শুরু করে ডবল ডিম, ঠান্ডা দুধে ভুট্টার চুরমুর, কলা কফি ইত্যাদি। নিম্নবিত্ত মানুষের অর্থের অভাব সেই কারণে হেভি ব্রেকফাস্টের বদলে জোটে খাই পরিবারের নির্ভেজাল গালাগাল। ভোরের আলোয় স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে সংসারের অভা। আজকাল ডাক্তারবাবুদের প্রশ্নের উত্তরে নিম্নবিত্তের জবাব হয়ে দাঁড়ায় লেখকের ভাষায়–

"আজ্ঞে প্রোটিন ভোরবেলা পাঁচিলে বসে কোঁকর কো ডাক সোনাই আর ফল-ফুল দোল খায় গাছের ডালে। পেটে টেনে আনার মতো চাঁদির জোর নেই ডাগদারসাব। জ্বালা নিয়ে বেঁচে থাকাই আমাদের অভ্যাস।"[১৩]

আবার আমরা 'পাঁঠা-পাঠি' রচনার মধ্যেও সেই একই চিত্র লক্ষ করি। মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে স্বপ্নটাই সব। দিবা স্বপ্ন আর নিদ্রার স্বপ্ন। মধ্যবিত্ত বাঙালি স্বপ্ন দেখে বলেই এখনো বেঁচে আছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের এক যুবতী মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গটি লেখক বর্ণনা করেছেন সুন্দরভাবে। মেয়েটির বিবাহ দিতে না পারায় তাদের মনের মধ্যে এক দুশ্চিন্তার ছাপ লক্ষ করেছেন। লেখকের ভাষায়–

"দুজনেরই চুলে পাক ধরেছে। দেহে মধ্য বয়স, মুখে বার্ধক্য। কপালে দুশ্চিন্তয়ার বলি যেনো প্রভাত সরোবরে বাতাসের হিল্লোল।"[১৪]

দাঁত একটা সাংঘাতিক জিনিস। মাড়ি ফুঁড়ে আপনা আপনি গজায়। ছেলে বেলায় ওঠার সময় একবার জ্বালাবে, তারপর মধ্যবয়সে এলোমেলোভাবে গজালে বিয়ের সময় বিপদ বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে। পাত্রের অভিভাবকরা যদি চালাক হয় তাহলে একটু হাসতে বলবে হাসোতো মা! দাঁতেরও উত্তরাধিকার আছে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে দন্ত চিকিৎসায় ফেসিওলজির মাধ্যমে শুধু দাঁত উপড়ানো বা গর্ত বোঝানো নয় গোটা মুখের ভূগোল পরিবর্তন করে দিতে পারে দন্ত চিকিৎসকরা। জগতের সামনে একটা সুন্দর মুখ তুলে ধরার জন্য কত কষ্ট স্বীকার। এযুগে মানুষের মন দেখার লোক নেই -রূপটাই সব। যার অর্থ আছে সে ততো এইসমস্ত কাজ করাবে আর যার অর্থ নেই সে সারাজীবন দাঁত খিচিয়ে মরবে। লেখকের ভাষায়–

"যেসব মেয়ের মাড়ি উঁচু, তারা ভীষণ ভালোমানুষ হয়। সামনের দুটো দাঁতে ফাঁক থাকলে ধার্মিক হয়। হয় ঈশ্বর বিশ্বাসী। ছোট ছোট ঠাস দাঁত হলে মানুষ অহংকারী আত্মকেন্দ্রিক হয়, নিষ্ঠুর হয়।"[১৫]

আসলে দাঁত হল শয়তান। দাঁত নিয়ে ভোগান্তি হয়নি এমন লোক পাওয়া যাবেনা বললেই চলে। তিন রকমের শূলের প্রসঙ্গও তিনি টানেন। পিত্তশূল, অম্লশূল, দন্তশূল। ব্যাথা এর কাছে ছেলেমানুষ। ব্রেন সেন্টারে সোজা যেনো শূলের খোঁচা। আর সেখান থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ স্বমূলে দাঁতের উৎপাটন। আর সে উৎপাটনও যে মধুর নয় -যন্ত্রণাদায়ক। লেখক বর্ণনা করেছেন –

> "দন্তবিদদের ঘরে থাকে ড্রিল মেশিন। গলায় যত্ন করে বেঁধে দেবেন এক ন্যাপি, যেনো শিশুকে দুধ খাওয়ানো হবে। মাথাটাকে পেছনে হেলিয়ে দেবেন অদূরে, বলবেন বেশ বড়ো করে হাঁ করুণ। সূচগ্র ফোঁড়ক আর ফাড়ক যন্ত্র নেমে আসবে উপদ্রুত দাঁতের স্পর্শকাতর ভূমিতে। শলাকা ঘুরবে কিরকির শব্দে গভীর থেকে গভীরতরহবে দাঁতের গর্ত। শিউরে উঠতে থাগবে গোটা শরীর। মনে হতে থাগবে দাঁত কেন হয়? সেই গর্তে চিকিৎসক ঢালবেন গলিত ধাতু। ...প্রতিটি উৎপাটনের পর তরল পথ্য।"[১৬]

দাঁত থাকলে তা যেমন ভোগাবেই, মধ্যবিত্ত পরিবারে অর্থের অভাব ঘটলে মানসিক যন্ত্রনা বাড়বেই। যাদের অর্থ আছে তারা নতুন দাঁতের সারি লাগিয়ে হাসতে থাকবে আর যাদের অর্থ নেই তাদের মুখ শূন্য অবস্থায় রয়ে যাবে। আসলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনের চরম সংকটময় অবস্থার চিত্রটি 'দাঁত' রচনায় সুন্দরভাবে ব্যঙ্গ করে বলেছেন। 'মশারি' রচনাটির মধ্যেও দারিদ্রের চরমতমো রূপটি বিদ্যমান। রচনাটির মধ্যে অরিন্দম ও তার স্ত্রীর একটা মশারি কেনার কাহিনী পাই। তারা রোজ রাতে স্বপ্ন দেখে একটা নতুন ঝলমলে মশারি কেনার। নতুন মশারি কেনার আগে অরিন্দম ও আরতি বারবার নানারকম উপায়ে তাদের পুরাতন মশারি তালি দিতে থাকে আর তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অতিবাহিত হতে থাকে। আর নিত্যদিন তারা একটা নতুন মশারির স্বপ্ন বুনছে। লেখকের ভাষায়–

> "আমি জেগে জেগে গভীর রাতের মশারি, শেষ রাতের মশারি, ভোরের মশারি দেখলুম |মনে হলো যেনো স্বপ্নরা ঘরময় পায়চারি করছে।"[১৭]

আবার 'জুতা' রচনাটির মধ্যেও মধ্যবিত্তের চরম সংকটের চিত্র বর্তমান। জুতা কেনা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এক গভীর চিন্তার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে কথক। লেখকের কথায়–

> "এতো দাম দিয়ে আমার একজোড়া জুতো কেনা উচিত হবে কি না? আসলে আমি তখন আমার এই কেনার ব্যাপারে একটা জোরালো নৈতিক সমর্থন খুঁজছিলাম।"[১৮]

আসলে একজোড়া জুতো কিনে ছোট হবে কি বড়ো হবে এই দুশ্চিন্তা একমাত্র মধ্যবিত্ত জীবনেই ঘটে থাকে। বিত্তবান মানুষের পক্ষে এটা একটা সাধারণ ব্যাপার কিন্তু মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের পক্ষে সেটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আসলে সঞ্জীববাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর রম্যরচনার মধ্যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন অসংগতি, নানা সমস্যা ও জটিল জীবনকে তিনি সুন্দর ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর রম্যরচনায় তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তীক্ষ্ণ রসবোধের সঙ্গে তীব্র শ্লেষের প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ব্ল্যাক হিউমারের নিকট বাংলা সাহিত্যে এই মুহূর্তে অন্তত কেউ নেই। পূর্বসুরীদের ধরলে তিনি এক না হলেও অদ্বিতীয় তো বটেই। বর্তমান প্রজন্মের এখনও কেউ তাঁর পাশে পৌঁছাতে পারেননি। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় তিনি একাই রাজত্ব করে চলেছেন। পাঠক তাঁর সাহিত্য ও রসবোধে বারবার সমৃদ্ধ হয়েছে কারণ তিনি কোনো কোনো কল্পিত কাহিনীকে তাঁর রচনায় স্থান দেননি। বাস্তবে চোখের সামনে যাকিছু দেখেছেন তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। সেই কারণে তাঁর রচনাগুলি সকল পাঠকের হৃদয়ে খুব সহজেই জায়গা করে নিয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন যে, সাহিত্য যদি কল্পনাশ্রীত হয় তাহলে সেটা গল্প হয়-সাহিত্য নয়। আসলে সাহিত্য হয় বাস্তবকে কেন্দ্র করেই। বাস্তবের সব খুঁটিনাটির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাঁর রচনায়। সেই কারণেই তাঁর রচনা হয়ে উঠেছে সমস্ত মানুষের কাছে এক সঞ্জীবনি মন্ত্র।

তথ্যসূত্র :

১. সঞ্জীব রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, লালমাতি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯, পৃ. ৫৪১
২. তদেব
৩. তদেব, পৃ. ৫৫০

৪. তদেব
৫. তদেব
৬. তদেব
৭. তদেব, পৃ. ৫৫১
৮. তদেব, পৃ. ৫৭৮
৯. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, নির্বাচিত রম্যরচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, দেজ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১২৯
১০. তদেব, পৃ. ১২০
১১. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, নির্বাচিত রম্যরচনা সমগ্র, চতুর্থ খন্ড, দেজ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২৫৩
১২. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, নির্বাচিত রম্যরচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, দেজ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ১৯১
১৩. তদেব, পৃ. ৪৬৩
১৪. তদেব
১৫. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, নির্বাচিত রম্যরচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, দেজ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯ পৃ. ১১০
১৬. তদেব, পৃ. ৮৯
১৭. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, শ্বেতপাথরের টেবিল, 'মশারি', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ৯১
১৮. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, শ্বেতপাথরের টেবিল, 'জুতা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ৭৭